জনগণের উপলব্ধি :
জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনমূখী সুন্দরবন নীতিমালার উপর একটি গবেষণা

একটি প্রদীপন প্রকাশনা

ISBN-13: 978-984-33337-80
9 789843 333780

সহযোগিতায়
মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

প্রদীপন

"জনগণের উপলব্ধি"-জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনমুখী সুন্দরবন নীতিমালার উপর একটি গবেষণা

গবেষক দল
সাউদিয়া আনোয়ার - জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ
এ্যাড. লিয়াকত আলী মোল্যা - আইন উপদেষ্টা
ফরিদা খানম- মাঠ গবেষক
নাছিমা জাহান- মাঠ গবেষক

আইএসবিএন ঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩৩৭৮-০।

Prodipan
প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন
মহুয়া লেয়া ফালিয়া
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (রাইটস)
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা পরিষদ
বিশ্বনাথ রায়
প্রধান নির্বাহী, প্রদীপন

শেখ জাহিদুর রহমান
প্রকল্প সমন্বয়কারী,
প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

এ.কে.এম মাহমুদ হাসান
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

সম্পাদনা
ফেরদৌসউর রহমান
সভাপতি, প্রদীপন

প্রকাশকাল
জুন, ২০১১

প্রচ্ছদ
শেখর বিশ্বাস

গ্রাফিক্স
এস. আকাশ, অংকুর, খুলনা

মুদ্রণ
প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস, ৪৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা ০৪১-৮১০৯৫৭

প্রকাশনায়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় প্রদীপন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সুন্দরবনে আহরণযোগ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পেশাজীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

মুখবন্ধ

ইউনেস্কো ঘোষিত 'হেরিটেজ সাইট' বা 'বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ' পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন 'সুন্দরবন' বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ও ভারত জুড়ে অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২ শতাংশ এবং মোট বনাঞ্চলের ৪৪ শতাংশ জুড়ে থাকা এ বনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। মূল্যবান প্রাণীজ, জলজ ও বনজ সম্পদ মিলিয়ে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের আঁধার এই সুন্দরবন শুধু জীব-বৈচিত্রের উৎস নয়, একই সাথে সুন্দরবন সংলগ্ন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকার উৎস হিসেবে অবদান রাখছে। প্রাকৃতিক এই সবুজ বেষ্টনী শত শত বছর ধরে উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের ছোবল থেকে রক্ষা করে চলেছে।

নদীর পানির স্বাভাবিক গতি ব্যাহত, লবনাক্ততা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ, সুন্দরবনের সম্পদের পুনঃ সৃষ্টির হার হ্রাস এবং অপরিকল্পিত আহরণ, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং জাহাজের দুষিত তেল পড়া, জাহাজ ভাঙ্গার কাজ, অপরিশোধিত রাসায়নিক দ্রব্য এবং শিল্প বর্জ্য ইত্যাদির কারনে লবনাক্ততা ও বালুর পরিমান বৃদ্ধি, জোয়ারের স্থিতিকাল অনেক বেশী, নদীর তলদেশ ও ভূমি উঁচু হয়েছে ফলে সুন্দরবনের মূল্যবান প্রাণীজ, জলজ ও বনজ সম্পদ মারাত্মক ভাবে ধ্বংসে হচ্ছে ফলে সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য ক্ষুন্ন হচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক ইকো-সিস্টেমের উপর। অপর দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, বনজ সম্পদ আগের চেয়ে কমে যাওয়া, সুন্দরবন সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ও অসচেতন ভাবে আহরণ, যথেচ্ছা ব্যবহার এবং নির্বিচারে বন নিধনের ফলে আজ এ বিশাল সম্পদের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন। যে কারণে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীদের জীবিকা নির্বাহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ অবক্ষয় চলতে থাকলে সুন্দরবনের অস্তিত্ব এক সময় বিলীন হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে নতুন যে পরিবেশের সৃষ্টি হবে তা হবে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। এর জন্য সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল কয়েক লক্ষ পেশাজীবী মানুষ এবং তাদের পরিবার। এ ক্ষতির প্রভাব স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পড়বে বলে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

প্রদীপন স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গত সাত বৎসর ধরে সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পেশাজীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় সুন্দরবনের সংরক্ষণ ও এ বনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পেশাজীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ এর ক্ষেত্রে দুটি বাধা অন্যতম।

প্রথমত: জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার জন্য কোন যুগোপযোগী আইন/নীতিমালা না থাকা।
দ্বিতীয়ত: জনগণের অংশীদারিত্বমূলক সুন্দরবন সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা না থাকা।

বন আইন ও বন বিভাগের সম্পদ-সামর্থ্য-সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকায় সুন্দরবন সংরক্ষণে বন বিভাগের পাশাপাশি জনগণের সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রায়শই উঠে আসছে বিভিন্ন সভা-সেমিনার-ফোরামে। প্রদীপন সুন্দরবনের একটা গনমুখী বন নীতিমালার ধারনা প্রদানের মাধ্যমে পলিসি গঠনের প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার তাগিদ অনুভব করে ।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদীপন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে গনমুখী সুন্দরবন নীতিমালার উপর একটি গবেষণা কাজ হাতে নেয়। যে গবেষণা স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের সুন্দরবনের পেশাজীবী থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণীর জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন কনসালটেশনের ভিত্তিতে করা হয়। ঐ সকল কনসালটেশনের কতিপয় পূর্বশর্ত ছিল সরাসরি সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করে জীবীকা নির্বাহের স্বার্থ ও সাথে সাথে বনের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। পূর্বশর্তটি একত্রে এভাবে উলেখ করা যায়; "বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়ায় বনের সম্পদের আহরণ ও বন্টন প্রবর্তনের মাধ্যমে বনের পুনঃসৃষ্টির জন্য একটি গনমুখী নীতিমালা" যা নিশ্চিত করবে-

(ক) বনের প্রাকৃতিক পুনঃসৃষ্টি
(খ) বন সম্পদের বৈজ্ঞানিক আহরণ এবং
(গ) বনের উপর বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ কমানো।

গবেষণাটির মূল বিষয়সমূহ আমরা এই সংকলনটিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। যারা এই গবেষণাটির স্টাডি টিমে ছিলেন, গবেষণাটি প্রকাশনায়, সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। এই গবেষণালব্ধ সংকলনটির প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মতামত নির্ভর। এখানে যদি কোনভাবে কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর বিব্রত হবার মত কোন বিশেষ বিষয় উলেখিত হয়ে থাকে তা কাউকে আক্রমন বা হেয় করার জন্য করা হয়নি। গবেষণার ঐ অংশটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

আমাদের প্রত্যাশা এই গবেষণার বিষয়টি নিয়ে সকল স্তরের দেশপ্রেমী মানুষ সুন্দরবন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হবে ও অনুপ্রেরণা পাবে। সুন্দরবন সংরক্ষিত হবে, সংরক্ষিত হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবীকা, বাংলাদেশ তথা বিশ্বের এই ঐতিহ্য সুন্দরবন হবে দীর্ঘস্থায়ী।

ফেরদৌসউর রহমান
সভাপতি, প্রদীপন

সুচীপত্র

১. ভূমিকা ০৬
২. পরিবেশগত বির্পযয় ও সুন্দরবন ০৭
৩. সুন্দরবনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ০৯
৪. সুন্দরবন উন্নয়ন সম্পর্কিত বর্তমান নীতিমালা ও কর্মসমূহ ১১
৫. ১৯৯৪ সালের বন নীতিমালার উদ্দেশ্য সমূহ ১২
৬. ১৯৯৪ সালের জাতীয় বন নীতিমালার ঘোষনা ১২
৭. "জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল সুন্দরবন নীতিমালা" সম্পর্কে জনগনের সুপারিশ সমূহ ১৩
ক) বনসীমা ও এলাকা;
খ) সম্পদ এলাকা এবং সম্পদ প্রাক্কলণ ;
গ) বনে প্রবেশ ;
ঘ) সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদ;
ঙ) বনে কাজে করার সময় আহরণকারীদের সেবা ;
চ) সরকার নিয়োজিত বন বিভাগের কর্মকতাদের সেবা;
ছ) বনজ সম্পদ আহরণকারীদের নিরাপত্তা ;
জ) বনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগনের সেবা ও নিরাপত্তা;
৮. জলবায়ু পরিবর্তনের পেক্ষাপটে বন আইনের সীমাবদ্ধতা/অপার্যাপ্ততা ১৮
৯. প্রচলিত বন আইনের মধ্যে এই পলিসি অনুশীলন/ খাপ খাওয়ানো সুযোগ ২০
১০. সুত্র: ২০

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

BLC	-	(বনে প্রবেশ অনুমতিপত্র) নৌকা বোঝাইকরণ সনদপত্র
FCDI	-	বন্যা নিয়ন্ত্রন, খনন ও সেচ ব্যবস্থা
FD	-	বন বিভাগ
CBA	-	সম্পদ সংগ্রাহের দরকষাকষি এজেন্সি
FDI	-	সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ
FSMP	-	বনবিভাগের মাস্টার প্লান
GMB	-	গঙ্গা- ব্রক্ষপুত্র- মেঘনা
ICZM	-	সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা
ID Card	-	পরিচয় পত্র
IOC	-	আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী
IPCC	-	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃ সরকারী প্যানেল
NGO	-	বেসরকারী সংস্থা
UNDP	-	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী
UNEP	-	জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী
UNESCO	-	জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান বিষয়ক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা
NAPA	-	জাতীয় খাপ খাওয়ানো কর্মকান্ডের পরিকল্পনা
RAB	-	র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটেলিয়ান

ভূমিকা ঃ

সুন্দরবন বাংলাদেশের একটি বৃহৎ সংরক্ষিত বন ও পৃথিবীর একক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চালে ৪০ কি:মি: দূরত্বের মধ্যে (ইমপ্যাক্ট জোন) বসবাসকারী প্রায় ৫ মিলিয়নের বেশী পরিবার জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে এ বনকে কেন্দ্র করে। সুন্দরবনে বিভিন্ন পেশাজীবী দল সক্রিয়।

প্রধান পেশাজীবীরা হল-

ক) বাওয়ালী/ কাঠুরে
খ) মৎস্যজীবী
গ) মধুসংগ্রহকারী/ মৌয়াল
ঘ) কাঁকড়া সংগ্রহকারী
ঙ) গোলপাতা সংগ্রহকারী/ কর্তনকারী
চ) অকাষ্ঠল সম্পদ সংগ্রহকারী
ছ) মাঝি
জ) বনের বিভিন্ন সম্পদ ব্যবসায়ী
ঝ) ডাকাত ও আইনের আশ্রয়চ্যুত লোক

বিভিন্ন পেশাজীবিদের মধ্যে একটি সাধারণ বিষয়ে মিল আছে যে, তারা সবাই সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যখন তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করে তখন পেশাজীবীদের মধ্যে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন আহরণযোগ্য সম্পদের বৈজ্ঞানিক সংগ্রহের একটি ভাল উপায় বা পদ্ধতি অনুসরণ করে সরকারের বনবিভাগ এ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে যা বিভিন্ন পেশাজীবীদের স্থায়িত্বের ও বনের পুনরুজ্জীবন নিশ্চিত করবে।

বিভিন্ন সময়ে কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯২৭ সালের পুরাতন বন আইন দ্বারা বনের সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বন আইনে (ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ (খ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এর মত প্রসঙ্গগুলোকে আমলে আনা হয় নাই। সময়োপযোগীতা, জনগনের সহযোগিতা, জনমুখী বন সংরক্ষণ ও এর পরিকল্পিত ব্যবহার এবং পুনঃবনায়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো এই আইন ও আইনের ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ অবস্থায় লবনাক্ততা ও সাইক্লোন বৃদ্ধি এবং জোয়ার ভাটার গতি বৃদ্ধির মত প্রেক্ষাপটে সম্পদ আহরণের জন্য জনমুখী ও নিয়ন্ত্রিত একটা পলিসি রূপরেখার প্রয়োজন।

সকল পেশাজীবীগোষ্ঠীর জীবিকায়ন, নিয়োগ প্রাপ্তি এবং কাজের সুবিধার জন্য বনসম্পদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠা ব্যবসায়ীদের সাথে পেশাদারী সম্পর্ক আছে। যখন এই সম্পর্ক বনের সম্পদের থেকে সীমাহীন লাভের উপায়ের দিকে চলে যায় তখন সব একজোট হয়ে বন সম্পদের ধ্বংসাত্মক আহরণের দিকে ধাবিত হয়। যার কারনে বনসম্পদ আহরণের একটা ফলপ্রসু নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি/ কৌশলের প্রয়োজন এবং এই গবেষণার মধ্য দিয়ে অতিমাত্রায় বনসম্পদ আহরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বর্তমান সময়ে বনকে রক্ষার জন্য একটা বাস্তব সম্মত চাহিদা উঠে আসছে।

সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণের মধ্যে একটি মনস্তাত্বিক ভাবনার জন্ম নিয়েছে যে, জ্বালানী কাঠ, ঘর নির্মান সামগ্রী এবং আসবাবপত্র তৈরীর সহজ উৎস হল এই বন। এই ধরনের মানসিকতায় কখনও বনের উৎপাদন হ্রাস হিসাব করা হয় না। এই ধরনের মানসিকতা বনের পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল জনগনের মধ্যে বাছ-বিচার না করেই বিক্ষিপ্তভাবে বনসম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করে। বনসংলগ্ন এলাকায় জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে অর্থবহ ও পুনঃবনায়নের দিক নির্দেশনা মূলক জনমুখী সুন্দরবন নীতিমালা প্রণয়ন অত্যাবশ্যকীয় যার ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগন ধ্বংসাত্বক কাজের বদলে বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়ন কাজে উদ্বুদ্ধ হবে।

খুলনা ভিত্তিক একটি জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'প্রদীপন', 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর আর্থিক সহায়তায় গত সাত বৎসর ধরে সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পেশাজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী পেশাজীবীদের সুন্দরবনের সম্পদের উপর অভিগম্যতা এবং একই সাথে তারা যেন নিজেরা নিজেদেরকে বন সংরক্ষক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে তা নিশ্চিত করা। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যাবধানে সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় বিভিন্ন সময় জনসাধারণের সাথে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সকল আলোচনার পূর্বশর্ত ছিল সরাসরি সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করা জনগণের স্বার্থ এবং এর সাথে বন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা । পূর্বশর্তটিকে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:

"বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়ায় বন সম্পদ আহরণ ও বন্টন প্রবর্তনের মাধ্যমে পুনঃবনায়নের জন্য একটি জনমুখী নীতিমালা" যা

(ক) বনের উপর বর্ধিত জনগনের চাপ হ্রাস করবে;
(খ) বন সম্পদের বৈজ্ঞানিক আহরণ নিশ্চিত করবে এবং
(গ) বনের প্রাকৃতিক পুনঃউৎপাদন নিশ্চিত করবে।

প্রদীপন জনমুখী সুন্দরবনের নীতিমালার ধারনা প্রদানের মাধ্যমে পলিসি গঠন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার তাগিদ অনুভব করে যা অবশ্যই সুন্দরবনের পেশাজীবীদের সাথে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে রচিত হবে। জনসাধারণের সুপারিশকৃত দিক নির্দেশনামূলক পলিসি ডকুমেন্টটি নীতিনির্ধারকদের কাছে মূল ডকুমেন্ট হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উপস্থাপন করা হবে যাতে একটা প্রকৃত পলিসি তৈরী করা সহজতর হয়। বর্তমান ডকুমেন্টটি সংস্থার এই প্রয়াসের একটি সারাংশ মাত্র।

পরিবেশগত বিপর্যয় ও সুন্দরবন

দারিদ্রতা, অধিক জনসংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতার অভাব প্রভৃতি কারনে পরিবেশগত বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়, যা অ-বনায়ন, জলাভূমির বিনাশ, মাটির উর্বরতা হ্রাস ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এছাড়াও বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষয়-ক্ষতিরও কারণ হিসেবে বিবেচিত।

সুন্দরবনের একটা স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। ৪২৫ প্রজাতির বন্য প্রানী সুন্দরবনে সনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩০০ প্রজাতির পাখি, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৮ প্রজাতির উভচর প্রানী (আইইউসিএন, ২০০২)। উলেখ্য যে, এই বনাঞ্চলের রয়েল বেঙ্গল টাইগার স্থানীয়ভাবে খুব প্রসিদ্ধ। জীববৈচিত্র্যের এই সমৃদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ এবং ভারতের সুন্দরবন ইউনেস্কো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

অসংখ্য ছোট ছোট নদী ও নদীর মিলন স্থলে বন অবস্থিত যা লোনা ও মিষ্টি পানির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। প্রথমটি দৈনন্দিন জলপ্রবাহের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টি নদী ও প্রচন্ড বেগের মাধ্যমে আসে যা প্রতিনিয়ত বনের তলদেশ হতে লবণাক্ততাকে অপসারিত করে। বনটির উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল এখন বিপর্যস্ত অবস্থায় নিপতিত। অল্প সময়ের ব্যাবধানে সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব ও গভীর সমুদ্রের লবন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

নদীর পানির স্বাভাবিক গতিপথে বাধা, লবনাক্ততা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ, অধিকমাত্রায় গাছ কর্তন, অব্যাবস্থাপনা, দূর্নীতি, জাহাজের দূষিত তেল পড়া, জাহাজ ভাঙ্গার কাজ, অপরিশোধিত রাসায়নিক দ্রব্য এবং শিল্প বর্জ্য ইত্যাদির কারনে সুন্দরবনের বাইরে থেকে আসা উদ্ভিদকূল ও শৈবালরাশি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত (আলী ১৯৯০)।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসারে গত তিন যুগে এই অঞ্চলের পানির মধ্যকার পিএইচ স্তর কমেছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে অম্লত্ব ও বিশিষ্ট অক্সিজেন কমে যাওয়ায় সুন্দরবনের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যের ব্যাপক বিবর্তন ঘটতে পারে বলে বৈজ্ঞানিকরা আশংকা করছেন। এতদ্বসংগে এই এলাকায় বর্ধিত জনসংখ্যার বসতি স্থাপন ব্যাপক বনউজাড়কে প্ররোচিত করতে পারে। কখনও কখনও নিরক্ষীয় ঝড় ও সাইক্লোনকে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল উজাড়ে ভূমিকা রাখে। উদাহরণ স্বরূপ: সাইক্লোন সিডর (৮ থেকে ১০)% বন সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছিল যা আর কখনো জন্মাবে না, ১৫% বন আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল যার একাংশ পুনরায় জন্মানোর সম্ভাবনা আছে। হেরিটেজ অঞ্চলের ৪ লাখ হেক্টরের এক-চতুর্থাংশের অধিক বন এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছিল সিডর। যা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আরও ৪০ বৎসরের বেশী সময় লাগবে বলে গবেষকরা মনে করেন। বর্তমান দশকের মধ্যেই প্রায় দেড় ডজন সাইক্লোন সুন্দরবনে আঘাত হেনেছে।

আরও ধারনা করা হয় যে বাস্পীয়প্রস্বেদন এবং গঙ্গা নদীর স্রোতধারা শীতকালে নদীর লবনাক্ততা এবং বনের মধ্যে লবন পানির প্রবেশকে উৎসাহিত করে (ওয়ারিক এবং আহমেদ, ১৯৯৬)। একই মৌসুমে সুন্দরবনে সমুদ্র পৃষ্ঠের উঁচু এলাকা থেকে মিঠা পানি প্রবাহ একটি বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই জলাভূমির পানি হ্রাসকরণকে ব্যাহত করে (অথবা জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি করে) ফলশ্রুতিতে বনের মধ্যে বালুর তলানী বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই বালুকরণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধির ফলে বনের মধ্যে বড় দানার কঠিন পদার্থ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বচ্ছতা হ্রাস পাচ্ছে। এই স্বচ্ছতা হ্রাস পাওয়ার ফলে গাছপালার বেড়ে উঠা ও ফাইটোপ্লাংটন এর জীবন ধারনের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। ফাইটোপ্লাংটন হলো সেই সব ক্ষুদ্র আনুবীক্ষনিক প্রানী যারা সমুদ্রে বাস করে ও তিন চতুর্থাংশ অক্সিজেন উৎপাদন করে এবং যারা নার্সারীতে বেড়ে ওঠা ১৫০-২৫০ প্রজাতির মাছের প্রজনন ও অন্যান্য প্রানীর জীবন ধারন নিশ্চিত করে।

লবনাক্ততা ও বালির পরিমান বৃদ্ধির ফলে এই বনে যেসব উদ্ভিদ জন্ম নিচ্ছে তারা ধ্বংস হচ্ছে এবং বড় বড় উদ্ভিদ মারা যাচ্ছে। তাছাড়া রোগ সৃষ্টিকারী ফাংগাসকেও এক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ম্যানগ্রোভ হলো মিঠা পানি ধারনের জন্য সবচেয়ে উন্নত স্থান এবং স্রোতের পানি সঞ্চালনের জন্য উত্তম জায়গা। কিন্তু উপকূলীয় বাঁধ সৃষ্টি করে প্রবাহিত পানিকে কৃষি কাজে ব্যবহার করার কারনে ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে মিঠা পানির প্রবাহ মারত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। নদীর স্রোতের প্রবাহ হ্রাস এবং মিঠা পানির স্বল্প প্রবাহ ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের লবনাক্ততাকে বৃদ্ধি করছে এবং ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা হ্রাস করছে।

অনেক নৃতাত্ত্বিক কর্মকান্ডের দ্বারা ম্যানগ্রোভ বনের প্রতিবেশ সমস্যা সৃষ্টি হয় যাহা প্রাকৃতিক উপায়ে বনসুরক্ষার পক্ষে যায় না। প্রথমটি হল, গঙ্গার পানি প্রবাহের গতি পরিবর্তন। ১৯৭৪ সালে ভারত নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের ফলে শুকনো মৌসুমে গঙ্গার ৪০ ভাগ পানি অন্য দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়। যা বছরের বিভিন্ন সময় বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে মিষ্টি পানির প্রবাহ কমিয়ে দেয় এবং লবনাক্ত পানির অনু:প্রবেশ বৃদ্ধি করে যা গাছ পালার বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে এবং পরিশেষে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়।

তেলের নিঃস্বরন, জলজ উদ্ভিদ এবং সামুদ্রিক পাখির ব্যাপক ধ্বংসের কারন হয়। মোংলা সমুদ্রবন্দর তেল নিঃস্বরনের প্রধান উৎস, দুষন হয় অসংখ্য বড় বড় জাহাজ দ্বারা যাহা প্রতিদিন সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে উত্তর পূর্ব দিকে চলাচল করে। গাছ পালা ও জলজ উদ্ভিদের ধ্বংস সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ন ও নিকটতম হুমকী। ১৯৮০ সালে ১টি পরিসংখ্যান দেখিয়েছে যে, ১৯৫৯ সালের বন বিবরনীর পর থেকে ম্যানগ্রোভ এর প্রধান প্রকার যাহা স্থানীয়ভাবে সুন্দরী হিসেবে পরিচিত অর্থাৎ হেরিটেরিয়া ফোম (Heriteria fomes) এর মজুদ ৪০% হারে কমে যাচ্ছে। একই সময় অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য প্রজাতি এক্সকোসারিয়া এগালোসা (Excoecaria agallocha) ৪৫% হারে হ্রাস পাচ্ছে। যে কোন বাংলাদেশীর জন্য এটা দু:খ জনক যে অদূর ভবিষ্যতে, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে সুন্দরী গাছ ধংসের এই প্রবনতা অব্যাহত থাকলে সুন্দরী কাঠের সম্ভাব্য বিলুপ্তির জন্য সুন্দরবন নামকরণ মিথ্যায় পর্যবসিত হবে।

বনজ সম্পদের লুণ্ঠন ও বিবেক বিবর্জিত ব্যবহার এবং উৎপাদন নির্ভর বন ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের বনজ সম্পদ হারানোর প্রধান কারন মনে করা হয়, যাহা জীববৈচিত্র্যের উপর হুমকীস্বরূপ। কৃষির উপর মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপ, সাধারন ও দেশজ বৈচিত্র্যের বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি কৃষির উপর হস্তক্ষেপ বিশেষ করে অপরিকল্পিত চিংড়ী চাষ এবং ম্যানগ্রোভ বনের ব্যাপক ধ্বংসের সাথে সাথে সকল বন্য মাছের ধ্বংসের কারন হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া দেশের ব্যাপক এলাকা জুড়ে এককভাবে একটি গাছ রোপনের জন্য প্রাকৃতিক বন ধ্বংস এবং কিছু এলাকায় বহিরাগত প্রজাতির বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ বৈচিত্র্যতা ক্রমশ:হ্রাস পাচ্ছে। সমৃদ্ধশালী সুন্দরবনের নানাপ্রকারের গাছ পালাই বন্য প্রানীদের জন্য আদর্শ আবাসস্থল এবং গাছপালার বৈচিত্র্যতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে পশু পাখিদের বাসস্থান, অস্তিত্ব এবং প্রাচুর্যতাও ধ্বংস হচ্ছে। জেলেদের অবৈধ ফাঁদ ও শিকারের কারনে বনের মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয় এবং এই অবৈধ কর্মকান্ডে কাঠ সংগ্রহকারীরাও লিপ্ত থাকে ।

সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্যের প্রতি প্রধান হুমকী হিসেবে নিম্নলিখিত কারন গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা:

- জনসংখ্যার চাপ, কৃষি জমির আওতাবৃদ্ধি, গৃহ ও রাস্তা নির্মান এবং গৃহপালিত পশুর চারণভূমি।
- নির্বিচারে বনজ সম্পদ আহরণ এবং পুনঃবনায়নের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ।
- বন্যপ্রানী সংরক্ষিত এলাকার পরিসর বৃদ্ধি ও সঠিক ব্যবস্থাপনা নিমিত্তে নীতিমালার অভাব।
- সংরক্ষণ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য এ পর্যন্ত যা সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষনার অভাব।

পরিবেশগত অবক্ষয় এবং বেপরোয়া সম্পদ আহরণ সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুন্দরবন এখনও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা সরবরাহ করছে। জীব বৈচিত্র্য, খাবার, আঁশ/তন্তু, জ্বালানী, গৃহপালিত পশুর খাদ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রধান উৎস হিসেবে বন (খান এবং মজুমদার) সংরক্ষণ এবং টেকসই উপায়ে এর সঠিক ব্যবহারের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ ও জ্ঞানবৃদ্ধি আশু প্রয়োজন।

সুন্দরবনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন, যা গাছপালা ও পশুপাখির বৈচিত্র্যতার দিক দিয়ে অন্যতম বৃহৎ জীববৈচিত্র্য নিশ্চিত করে। গাছপালার বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে সুন্দরবনকে ৩ টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) মিঠা পানির বনাঞ্চল (উত্তর-পূর্বাংশ) (২) আংশিক লবনাক্ত বনাঞ্চল (পূর্বাঞ্চল) (৩) এবং লবনাক্ত বনাঞ্চল (পশ্চিমাঞ্চল)। আনুপাতিক হারে তা মোট বনভূমির ২৮, ৪৬ ও ২৬ অংশ"(বিইউপি/সিইএআরএস/সিআরইউ), যা সামুদ্রিক উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে অন্যতম হটস্পট হিসেবে বিবেচিত

হবে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত মরু অঞ্চলের বরফ গলন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের আয়তন বৃদ্ধি কারন দুটি দায়ী। ১৭০০ সালে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়েছিল ২ সে: মি:, ১৮০০ সালে ৬ সে: মি: এবং তা ১৯০০ সালে বাড়ে ১৯ সে: মি:(ইউইপি ইয়ার বুক ২০০৯)। এটা ধারনা করা হয় যে, আগামী ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ৫০ সে: মি: যার ২/৩ অংশ বাড়বে আগামী শতাব্দীতে (ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট অব ইউকে, ২০০৯)। লবণাক্ততা বাংলাদেশের একটি ঋতুজনিত ব্যাপার, যা শীতকালে প্রকট আকার ধারন করে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এই লবণাক্ততার প্রক্রিয়াটিকে আরও ত্বরান্বিত করে নিম্নোক্ত উপায়ে:

(ক) উপরের দিক থেকে মিঠা পানির প্রবাহকে হ্রাস করে লবণাক্ত পানির প্রবাহকে উত্তরমুখী হয়ে প্রবাহিত করা
(খ) ভূ-গর্ভস্থ পানির সাথে ভূ-উপরিভাগের লবণাক্ত পানির সঞ্চালন প্রক্রিয়া
(গ) বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি যা লবণাক্ত পানিকে উপকূলীয় অঞ্চলে টেনে আনে

তাছাড়া উত্তর মুখী লবণাক্ত প্রবাহ যা দক্ষিনাঞ্চলীয় সুন্দরবনের পুরো জীববৈচিত্র্য কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে। গত তিন দশকের তুলনায় এখন ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি গাছপালা ও পশুপাখির জীবন ধারনের জন্য একটি বড় হুমকি।

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ এর নদী ও খালের লবনাক্ততার পরিমান ২৭-৩৩ পিপিটি, যেখানে হওয়া উচিত ছিল ৫-১০ পিপিটি। সুন্দরী, পশুর, কেওড়া, গেওয়া, বাইন, গরান, গর্জন, ধুন্দল, বেত, ঝাউ এবং হোগলাসহ অনেক বৈচিত্র্যময় গাছ 'আগামরা' (টপডাইং) রোগে আক্রান্ত হয়েছে, অনেক বর্নহীন হয়ে পড়েছে এবং অনেক গাছ মারা যাচ্ছে । শুধুমাত্র গাছ পালা নয়, অনেক প্রজাতির পশুপাখিও ভূ-পৃষ্ঠের লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে ধ্বংসের পথে। আন্তরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন কমিটি (আইপিসিসি, ১৯৯০) এর অনুমান অনুযায়ী সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা যদি ৪৫ সে:মি: বাড়ে তাহলে সুন্দরবনের গাছপালাসহ ৭৫% ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ মাটির লবনাক্ততা বৃদ্ধির জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে (ইউনেস্কো, ২০০৭)। ইতিমধ্যে লাওয়াছড়া দ্বীপ, নিউমুরী দ্বীপ, ও দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ সাগর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং ঘোরামারা দ্বীপ আংশিক নিমজ্জিত। (জর্জ-২০১০)

শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনই নয়, সাধারন জনগনও সুন্দরবনের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ব্যাপারে ওয়াকেবহাল। সাধারণ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ করেছে যে, গ্রীষ্মকালীন ব্যাপ্তি শীতকালীন ব্যাপ্তির চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের তুলনায় বর্তমানে মৌসুমী বায়ু ১৫ থেকে ২০ দিন বিলম্বিত হয়। কিছু লোক অবশ্য বলেন যে, বর্তমান বৎসরগুলিতে মেঘমুক্ত ও আর্দ্র গ্রীষ্মকালের দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গ্রামবাসীরা বলেন যে তারা এখন ভরা কাটালের সময় পানির স্তরের যথেষ্ট বৃদ্ধি দেখতে পান। মৌসুমী বায়ুর ধরন পরিবর্তনের কারনে কৃষির উপর প্রবল চাপ পড়েছে যা সম্পূর্ণ আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালের সময়কাল বৃদ্ধির কারনে শস্যতে কীট-পতঙ্গের আক্রমন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেরিতে শীত আসার কারনে রবি শস্যের (শীতকালীন শস্য) চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। যত্রতত্র কৃষি জমিতে লবনাক্ত পানি প্রবেশ করাতে কৃষকরা লোকসান ও বৃহৎ ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। স্থায়ীভাবে লোনাপানির প্রবেশ কৃষি চাষাবাদের জমি কমিয়ে দিচ্ছে এবং জনগনকে এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করছে। প্রকৃতির উপর মানুষের মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুটোর মিলিতভাবে বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে যা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলকে সংকুচিত কিংবা ধ্বংস করে দিতে পারে। সামগ্রিকভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের ছাড়া বন থাকতে পারে কিন্তু বন ছাড়া আমরা বাস করতে পারি না।

সুন্দরবন উন্নয়ন সম্পর্কিত বর্তমান নীতিমালা ও কর্মসমূহ

বন আইনের বিভিন্ন সংশোধনী, বন নীতিমালা কিংবা বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বন সুরক্ষার জন্য প্রণীত কিন্তু দুর্বল বাস্তবায়নের জন্য জীববৈচিত্র্য ক্রমশ:হ্রাস পাচ্ছে। ১৮৯৪ সালের জাতীয় বন আইন দেশে বন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ও নিয়মকানুনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিল যা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঘোষিত হয়েছিল।

(১) রাষ্ট্রীয় বনের প্রশাসনিক কার্য বৃহৎ পরিসরে পরিচালিত হবে সাধারণ জনগণের সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে যা বনসীমার আওতার মধ্যে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার ও অগ্রাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবে।
২) বনকে কয়েকটি শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছিল যেমন:
(ক) পাহাড়ী বন/ নিয়ন্ত্রিত বন
(খ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ/ উৎপাদনশীল বন
(গ) অগ্রধান বন এবং
(ঘ) গোচরণভূমি/ পশুচারণভূমি।
(৩) সমতলে কৃষিভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের জন্য পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত বন সংরক্ষণ করতে হবে।
(৪) গুরুত্বপূর্ণ বন পরিচালন ব্যায় রাষ্ট্রীয় রাজস্ব দ্বারা নির্বাহ করা হবে।
(৫) বনের আভ্যন্তরীন যে জমি চাষাবাদের জন্য উপযোগী তা চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থায় প্রকৃতিগতভাবে বনের কোন স্থায়ী ক্ষতি করা যাবে না।
(৬) স্থানীয় জনগন কম রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে পশুচারণ করার সুবিধা পাবে (বাংলাদেশ, ২০০৮)।

কনফারেন্সের দিক নির্দেশাবলী, ১৮৯৪ সালের বন নীতিমালা উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিল এবং একটা নতুন বন নীতিমালা ১৯৫৫ সালে ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে বন নীতিমালা আবারও সংস্কার করা হয় এবং ১৯৬২ সালের বন নীতিমালার প্রবর্তন হয়। ১৯৫৫ ও ১৯৬২ সালের বন নীতিমালা, বনসম্পদ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাবার উপর কম গুরুত্বারোপ করে যা সামগ্রিকভাবে বনের পরিসর বৃদ্ধির পক্ষে যায় না। ১৯৭৯ সালের বন নীতিমালা ছিল অত্যন্ত সাধারন ও অস্পষ্ট। বেশীর ভাগ সমস্যাসংকুল প্রেক্ষাপট, যেমন: বনের কার্যকরী প্রকারভেদ এবং বনভূমি ব্যবহার, স্থায়ীত্বশীল জীববৈচিত্র্যের উৎপাদনক্ষমতা বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামো প্রণয়নে বনের ভূমিকা, বনায়নে স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্ব/ অংশগ্রহন ইত্যাদি এই নীতিমালার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়নি। অতএব সরকার ১৯৭৯ সালের বন নীতিমালা সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সংস্কারকৃত বন নীতিমালা ১৯৯৪ সালের নীতিমালা নামে পরিচিত যা ১৯৯৫ সালের ৩১শে মে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল।

১৯৯৪ বন নীতিমালার উদ্দেশ্য ছিল, যাদের জীবিকায়ন বনসম্পদের উপর নির্ভর করে সেই জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা ন্যায্যতার ভিত্তিতে বন্টন, বনায়ন কর্মসূচীতে জনগনের অংশগ্রহন, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগনের মতামত ও সুপারিশের সমন্বয় প্রভৃতি। পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করতে এই পরিকল্পনা কাঠামো তৈরী করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনটি সূচক চিহ্নিত/ সনাক্ত করা হয়েছিল যথা: ১.স্থায়ীত্বশীলতা ২.দক্ষতা এবং ৩.জনগনের অংশগ্রহন। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর জাতিসংঘের কনফারেন্সে ২১ দফা বন নীতিমালার এজেন্ডার সাথে এই সূচকগুলি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

১৯৯৪ সালের বন নীতিমালার উদ্দেশ্য সমূহ

মূল উদ্দেশ্য সমূহ হল:

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন বিভাগের বৃহৎ অবদান নিশ্চিত করার জন্য বনভূমি, কৃষিখাতে অব্যবহৃত জমি, পতিত জমি, পার্শ্ববর্তী জমি, এবং অন্যান্য সম্ভাব্য সকল এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বনায়নের উদ্দ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মোট এলাকার প্রায় ২০ ভাগ বনায়ন করা।
- বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত/ ক্ষতিগ্রস্থ বন সংরক্ষণের মাধ্যমে জীবজন্তু ও পশুপাখির প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা।
- বিশেষ করে ভূমি ও জলজ সম্পদ সংরক্ষণের মত বন উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ঐ সমস্ত সহায়ক খাতকে সম্প্রসারনের মাধ্যমে কৃষিখাতকে শক্তিশালী করা।
- বিশ্ব উষ্ণায়ন, মরূকরণ এবং বন্য পশুপাখি ও জীবজন্তুর বানিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারের বিভিন্ন স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত চুক্তি বাস্তবায়নের দ্বারা জাতীয় দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।
- স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে বনভূমির বেআইনি পেশা ও বনউজাড় এবং বন্যজন্তু শিকার বন্ধ করা।
- প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে বনজ সম্পদের ফলপ্রসু ব্যবহার ও প্রয়োগকে উৎসাহিত করা।
- সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের ভূমির বনায়ন কর্মসূচীকে যথার্থভাবে তৈরী ও বাস্তবায়নের করা।

১৯৯৪ সালের জাতীয় বন নীতিমালার ঘোষনা

ঘোষিত ১৯৯৪ সালের জাতীয় বন নীতিমালাটি যা অংশীদারিত্ব বনায়নের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত তা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- ইজারার বন্টন চুক্তিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে সামাজিক বনায়ন এবং সামাজিক সম্পৃক্ততায় ইজারাকৃত বনায়নকে উৎসাহিত করতে হবে।
- নারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের ভূমি ভিত্তিক জীবিকায়নের উৎস নাই তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নার্সারী, বনায়ন, বন সম্পদ আহরণ এবং শিল্পায়ন কাজে নিযুক্ত হবে।
- রাস্তার পার্শ্বে, বেড়ী বাঁধে, খাল/ নদীর তীরে, এবং অন্য সরকারী অথবা প্রান্তিক জমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষদল অথবা আলাদা আলাদা পরিবার দ্বারা গাছ লাগানো হবে। যার উৎকর্ষতা সাধনে এনজিও অথবা সংশিষ্ট সংগঠন কাজ করবে।
- খামারের ও ব্যক্তিগত জমির বনায়ন ব্যাবস্থাপনা ভূমির মালিকদের কিংবা অনুমোদন প্রাপ্ত চাষীদের স্বপ্রণোদিত নীতিমালা অনুযায়ী বন ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে।
- নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাফার জোনে দীর্ঘ মেয়াদে ইজারার ভিত্তিতে গাছ রোপন ও বনায়নের জন্য সম্পৃক্ত হবে।
- রাষ্ট্র সকল ধরনের বনায়ন কাজ পরিচালনাকারীদের কারিগরী সহায়তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করবে।
- রাষ্ট্র দ্বারা গ্রামীন এলাকায় শিল্প কল-কারখানা নির্মান বা উন্নতি সাধন করা হবে, বিশেষ করে ঐ সমস্ত কুটির শিল্প এবং ছোট আকারের শ্রম নির্ভর শিল্প যা কাঠের প্রক্রিয়াজাত এবং অন্যান্য বন ভিত্তিক কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ও যা স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিদের আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পুনঃবনায়ন, বন উন্নয়ন ও গাছপালা ভিত্তিক গ্রামীন উন্নয়নে সরাসরি সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে যেখানে বৃক্ষ চাষীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হবে।

- বন সংরক্ষণ ও জাতীয় বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন বিভাগের কিন্তু অংশীদারিত্ব বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার জনগনকেও এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বনের মধ্যে এবং বনসংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাদের বন সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- অবনায়নকে অনুৎসাহিত এবং বনায়ন খামারের উন্নয়ন ঘটানোর স্বার্থে রাষ্ট্র অবশ্যই জমির ব্যবহার, কৃষি, শিল্প, বানিজ্য, অর্থনৈতিক এবং অন্য নীতিমালা এবং আইন প্রনয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে পরিবর্তন করতে পারবে।
- সামাজিক বনায়নকে শক্তিশালী করতে বন বিভাগকে পুনঃকাঠামো দিতে হবে ।

বাংলাদেশ অবশ্য আর ও দুটি বন সংশিষ্ট জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জাতীয় নীতিমালা এবং জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা। জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিবৃদ্ধি করা, দারিদ্রতা দূরীকরণ, বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি প্রভৃতির লক্ষ্যে বিশ বৎসরের (১৯৯০-২০১০) প্রেক্ষাপটে মহাপরিকল্পনা কাঠামো। জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা হল পরিবেশ ভারসাম্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা, পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় রোধ, টেকসই উন্নয়ন এবং সকল সম্পদের পরিবেশগত ও দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ীত্বশীলতার নিমিত্তে টেকসই ব্যবহার। ঐ তিনটি নীতির আলোকে সব কয়টি নির্দেশনা টেকসই বন উন্নয়নকে নিশ্চিত করে যা বনসংরক্ষণ, বনসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার, আন্তঃখাতগুলোর মধ্যে যোগসূত্র তৈরী এবং প্রত্যেক স্তরের জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে রচিত (বাংলাদেশ -২০০৮)। বর্তমান সময়কালে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী আমরা জনমুখী সুন্দরবন নীতিমালার জন্য দাবী করছি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জীববৈচিত্র্যের বাস্তগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবদান এবং স্থায়ীত্বশীল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীতে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে যদিও তা স্থানীয়ভাবে দারিদ্রতা দূরীকরণ করতে পারে। দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীর লক্ষ্য হওয়া উচিত যৌথ বনায়ন, যৌথ নার্সারী চাষ, যৌথ ফলজবাগান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কমিউনিটি ভিত্তিক যৌথ প্রানী ব্যবস্থাপনার মত যৌথ দারিদ্র ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি ।

"জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক সুন্দরবন উন্নয়ন নীতিমালা" জনগনের সুপারিশ সমূহ ঃ-

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রদীপন সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন শ্রেনীর পেশাজীবীদের একত্রিত করে বহু সংখ্যক কনসালটেশনের মাধ্যমে "জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনমুখী সুন্দরবন নীতিমালা" এর সুপারিশ সংগ্রহ করে।

নিম্নে সুপারিশমালা সমূহকে একত্রিত করে বিভিন্ন শিরোনামে উলেখ করা হয়েছে।

১. বনসীমা এবং অঞ্চল, ২. সম্পদ এলাকা এবং সম্পদ প্রাক্কলণ, ৩. বনে অনুপ্রবেশ, ৪. সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদ, ৫. বনে কাজ করা জনগনের কল্যাণ/ সেবা, ৬. সরকার নিয়োজিত বন বিভাগের কর্মকর্তাদের কল্যাণ/সেবা, ৭. বনে সম্পদ আহরণকারীদের নিরাপত্তা, ৮. বনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগনের সেবা ও নিরাপত্তা, ৯. বিবিধ

১। বনসীমা এবং অঞ্চল:

বনসীমানা বলতে বুঝাবে সুন্দরবনের বিস্তার বা পরিসর। বনের সীমানা সাধারনত পিলার বা নদী দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। বনের সীমানা পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান ও জনগনের বোধগম্য করে তৈরী করার প্রয়োজন।

ক) বনের সীমানা পরিবর্তন একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন বনের সীমানা পরিবর্তনের নাটকীয় পরিবর্তন আনবে। নীতিমালাটি আইনের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং বনের সীমানা পরিবর্তন রোধে কাজ করবে।

খ) প্রস্তাবিত নীতিমালাটি বনের সীমানা পরিবর্তনের কারনে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানান্তরিত জনগনের পুর্নবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

গ) যারা বনসীমানা অতিক্রম এবং বনের আন্তর্জাতিক সীমানা পরিবর্তনের কারন ঘটাবে তাদের শাস্তির জন্য অবশ্যই নীতিমালাটিতে কঠিন আইন থাকবে।

ঘ) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুন্দরবনের আন্তর্জাতিক সীমানা নিস্পত্তি এবং ভবিষ্যতের সীমানা পরিবর্তন বিষয়ে নিস্পত্তির একটা কৌশল নির্ধারন করতে হবে।

ঙ) বন সীমানার মধ্যে বা যে এলাকা বন সীমানার মধ্যে আসবে সে এলাকায় কৃষি, মৎস্য সংক্রান্ত, বনায়ন ইত্যাদির মত ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কাজ গ্রহনযোগ্য হবে না যা বনের পরিবেশকে (ইকো-সিস্টেমকে) ক্ষতিগ্রস্থ করে।

চ) পার্শ্ববর্তী কমিউনিটির জনগনের সাথে ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলদের ধারাবাহিক তদারকির মাধ্যমে সরকারের সাথে সমপর্যায়ে কাজ করা যেতে পারে। সরকারী বাছাই প্রক্রিয়ায় (সম্পদ সংরক্ষণে) প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ছ) বিভিন্ন প্রজাতির বন ও অন্যান্য উৎপাদিত সম্পদ যা বনসীমানার বাইরে বেড়ে উঠে তার মালিকানা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে। যেখানে সম্পদ উৎপাদিত হয়েছে সে জমির মালিকানা সর্ব প্রথমে বিবেচনায় আনতে হবে।

জ) সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী কিছু খাস জমি বিভিন্ন প্রজাতির কাষ্ঠল ও আকাষ্ঠল জাতীয় বন উৎপাদনে যৌথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কমিউনিটির মধ্যে বনায়ন, চাষাবাদ এবং উৎপাদনের অংশীদারিত্ব নির্ধারন করা যেতে পারে ।

ঝ) নতুনভাবে জেগে উঠা চরজমি এবং সমুদ্র তীরবর্তী ভূমি সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বনায়নের জন্য তৈরী করতে হবে।

ঞ) সমুদ্র স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে সুমুদ্রের পানির নিচে যে সমস্ত এলাকা তলিয়ে যাবে সে সমস্ত এলাকা সুন্দরবনের অংশ হিসাবে গন্য হবে এবং সমুদ্র সম্পদ ও উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আওতায় আনতে হবে।

২) সম্পদ এলাকা এবং সম্পদ প্রাক্কলণ :

ক) প্রধান প্রধান উৎপাদিত সম্পদ অনুসারে সুন্দরবনকে বিভিন্ন সম্পদ অঞ্চলে ভাগ করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক জরিপের মাধ্যমে প্রতি বছর উৎপাদনের পরিমান নির্ধারণ করতে হবে এবং তা পেশাজীবীদের জানাতে হবে।

খ) নিরূপিত সম্পদের উপর ভিত্তি করে সম্পদ সংগ্রহের অনুমতিপত্র প্রদান করতে হবে এবং সম্পদের প্রাচুর্যতা অনুসারে অনুমতিপত্র প্রদানে বন বিভাগকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কঠোর হতে হবে।

গ) দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎপাদিত বন সম্পদ আহরণের নির্দিষ্ট সময় বন বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) যারা পাশ-পারমিট পাবে না তারা সরাসরি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বা জীবিকায়ন পুর্নবাসন কর্মসূচীর আওতায় আসবে।

৩. বনে অনুপ্রবেশ :

বনে প্রবেশ বলতে- (১) বনের সম্পদ আহরণের জন্য বনে প্রবেশের অনুমতি (২) পর্যটনের উদ্দেশ্যে বনে প্রবেশের অনুমতি বোঝাবে।

ক) শুধুমাত্র নৌকায় বনে প্রবেশের অনুমতি পাবে। কিন্তু আর্থিক খরচ কমাতে কিছু অঞ্চলে পায়ে হেঁটে বনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

খ) বিএলসি/ পারমিট প্রদানে আরও স্বচ্ছ এবং নাম, ঠিকানা, ভোটার আইডি নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। দলের ক্ষেত্রে দলের প্রত্যেক সদস্যদের নাম, ঠিকানা, ভোটার আইডি নাম্বার উল্লেখ পূর্বক বিএলসি এন্ট্রি করতে হবে।

গ) বন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যেক পেশাজীবীকে প্রতি বছর নবায়নযোগ্য রেজিষ্টার আইডি কার্ড দিতে হবে।

ঘ) নির্ধারিত দিনের বেশী দিন বিএলসিধারীরা বনে থাকলে স্পট জরিমানা করার বিধান রাখতে হবে।

ঙ) স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং অন্য পেশাজীবীদের সমন্বয়ে প্রত্যেক বন অফিসে একটা কার্যকরী কিন্তু ছোট, জনগনের কমিটি পারমিট প্রদান (লিপিবদ্ধ) ও অন্য যে কোন অনিয়ম তদারকি করবে।

চ) শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে জরিপকৃত সম্পদের প্রাপ্যতা অনুসারে পাশ/পারমিট প্রদান করতে হবে।

ছ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সম্পদের ধরন পরিবর্তনের ও কিভাবে ঐ সকল পরিবর্তিত সম্পদ জনগনকে আশাবাদী করতে পারে সে বিষয়ে জনগনকে দক্ষ/ শিক্ষিত করে তুলতে বন বিভাগকে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

জ) সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া বন সম্পদের পুনঃসৃষ্টি অথবা স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করবে না এমন সম্পদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া গ্রহন করতে হবে।

ঝ) কর্মঠ পেশাজীবী যারা পাশ পারমিট গ্রহন করতে পারবে না তারা সরাসরি সরকারের জীবিকায়ন পুর্নবাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় চলে আসবে।

ঞ) একজন অনুমতিপত্র গ্রহণকারী যখন এন্ট্রি পারমিট বন অফিসে হস্তান্তর করবে তখন বন অফিস থেকে সে এন্ট্রি পারমিট হস্তান্তরের প্রমাণপত্র গ্রহন করবে।

ট) একই ব্যক্তি বা একই দল একই ধরনের সম্পদ সংগ্রহের জন্য একটা মৌসুমে সর্বোচ্চ তিনটি পারমিট গ্রহন করতে পারবে।

ঠ) রেজিস্টার্ড এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্যুরিজম এজেন্সির মাধ্যমে পর্যটন পারমিট বন্টন করতে হবে ।

ড) কোন ব্যক্তিগত পর্যটন কেন্দ্রের পারমিট বন এলাকায় দেওয়া যাবে না।

ঢ) টুরিজম/ পর্যটন সংস্থাদের কিছু নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করতে হবে যা পর্যটক কর্তৃক শুরু থেকেই মেনে চলতে হবে।

ণ) সুন্দরবনের প্রকৃত পেশাজীবীদের নাম তালিকাভূক্ত করার জন্য একটি নিরপেক্ষ জরীপ প্রয়োজন।

ত) পেশাজীবীদের বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে সনাক্ত এবং তালিকাভূক্ত করতে হবে।

থ) নৌকার আকার এবং পন্য আহরণের ধরনের উপর ভিত্তি করে সুন্দরবনে সম্পদ আহরণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারন করতে হবে।

দ) প্রতি বছর শতকরা দশভাগ তালিকা ভূক্ত পেশাজীবীকে অন্য পেশায় পুর্নবাসন করতে হবে।

ধ) প্রাকৃতিকভাবে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছির বংশ বিস্তারের জন্য মধু সংগ্রহের অনুমতি এক মৌসুমে সীমিত করতে হবে।

৪. সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদ ঃ

সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদ বলতে বুঝায়, বনের ঐসব উৎপাদিত সম্পদ যাদের পরিবর্তিত মূল্য আছে এবং যা রাজস্ব এবং অন্যান্য অর্থের বিনিময়ে বন বিভাগ হতে বৈধ অনুমতির মাধ্যমে সংগ্রহ ও একত্রিত করা হয়।

ক) বনের প্রধান গাছ যেমন সুন্দরী, গেওয়া, বাইন, গরান, কেওড়া, পশুর ইত্যাদিকে বৈজ্ঞানিকভাবে গণনা করতে হবে এবং সমন্বিত অংশগ্রহনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধবভাবে অপসারন/ পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) বনজসম্পদ যাহা পরিবর্তিত পরিবেশে আগামী ২০/৩০ বছরের মধ্যে পর্যাপ্তভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের সম্পর্কে গবেষনা করতে হবে।

গ) সুন্দরবনের পেশাজীবীদের জন্য সরকারকে আহরণযোগ্য সম্পদের ভবিষ্যত হিসাব নিরুপনের ভিত্তিতে একটি দীর্ঘমেয়াদী জীবিকা পুনর্বাসনের কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে।

ঘ) বনসম্পদ নির্বিচারে সংগ্রহ না করে গোলপাতা, নলখাগড়া ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকভাবে সংগ্রহ করতে হবে।

ঙ) সম্পদ আহরণের জন্য অনুমতি কঠোর হওয়া উচিৎ এবং অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে অনুমতিকৃত সম্পদ ছাড়া অন্যকোন সম্পদ আহরণ না করে।

চ) মধু আহরণের অনুমতি প্রদানকে সহজ করতে হবে এবং জন প্রতিনিধিকে অনুমতি প্রদান পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

ছ) বিশেষ অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানার ক্ষমতা বন কর্মকর্তাদের প্রদান করা যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জরিমানার তালিকা ঝুলিয়ে দিতে হবে এবং রেডিও এবং টেলিভিশনে সম্প্রচার করতে হবে। জরিমানা ছাড়াও যে কোন শাস্তির তালিকা আদালতে সরবরাহ করতে হবে।

জ) বন আইনে সকল জরিমানা প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীর মাধ্যমে করতে হবে এবং আপীলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঝ) জব্দকৃত কাঠের স্তুপ এবং অন্যান্য বনজ সম্পদের নিলামে বনের পেশাজীবীদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং বাহিরের লোকদের এ ধরনের নিলামে অংশগ্রহনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

ঞ) যাবতীয় তথ্যসহ সরকারের মাধ্যমে কমপক্ষে নিলামের ১ মাস পূর্বে ঘোষণা করতে হবে।

ট) বন আইনের কঠোর তথ্য প্রমাণাদি নিশ্চিত এবং বনে কাজ করা সরকারী লোক ও পেশাজীবীদের অপরাধের নিরপেক্ষ বিচারের জন্য আলাদা বন আদালত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ঠ) বন বিভাগের পেশাজীবীদের ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় অথবা একই প্রকারের নানারকম যৌথ দরকষাকষির সংগঠন তৈরী করার অধিকার থাকতে হবে।

ড) সকল বন সম্পদের জন্য একটা শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। সরকার বাৎসরিক একটা আয়-ব্যায়ের হিসাব প্রত্যেক বন এলাকায় তৈরী করবে এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করবে।

ঢ) বয়স্ক পেশাজীবীদের জন্য বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

ণ) পেশাজীবীদের মধ্যে বনে কিছু পেশাদারি দায়দায়িত্ব থাকবে এবং জনগনের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সেগুলি প্রচারিত হবে।

ত) বনের সম্পদ, তাদের বসতি, স্বাস্থ্য এবং জীবিকায়ন ধ্বংসের জন্য জনগন সরকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আনুসাঙ্গিক খরচ নিতে এবং আদালতে অভিযোগ করতে পারবে।

৫. বনে কাজ করা জনগনের কল্যাণ/সেবা ;

বনে কাজ করা লোকদের জনকল্যাণ বলতে সম্পদ আহরণের সময় সে সকল পেশাজীবীদের মানবীয় অধিকারের নিশ্চয়তা বুঝাবে যা বনের সম্পদ আহরণের সময় তাদের রক্ষা করবে।

ক) পারমিট প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে জীবন ও অন্যান্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে বীমা বাধ্যতামূলক করতে হবে । বনে মৃত্যু অথবা দূর্ঘটনার বীমা ফি পুরন করার জন্য পারমিট ফি এর একটা অংশ পৃথক করে রাখতে হবে।

খ) পেশাজীবীদের জন্য বনজ সম্পদ আহরণের নিয়ম/ আইন বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা এবং অনুপ্রেরণামূলক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

গ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বর্তমানে কিছু সম্পদ আহরণ বন্ধ ও নতুন কিছু সম্পদ আহরণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পরিকল্পনাটা তেমনভাবে আগে ভাগে করতে হবে যাতে পেশাজীবীরা ঐ সকল নতুন সম্পদ আহরণ করতে পারে।

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ মৎস্য আহরণের সময় সীমিত করতে হবে যেমন ডিম পাড়ার সময়কালে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখতে হবে।

ঙ) পেশাজীবীরা খাত ভিত্তিক সিবিএ গঠন করবে। এই সিবিএ যখন প্রয়োজন হবে তখন বীমা পেতে ও দাবী করতে সহায়তা করবে।

চ) মৃত অথবা পঙ্গু পেশাজীবীর উপকার নিশ্চিত করতে বীমায় পেশাজীবি ব্যক্তির প্রতিনিধি নির্বাচনের নিয়ম অবশ্যই থাকতে হবে।

ছ) বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত স্থানীয় তদন্ত কমিশন সুন্দরবনের পেশাজীবীদের দ্বারা যেকোন দুষ্কর্মের তদন্ত ও সুপারিশের কাজ করবে।

জ) কম ঝুঁকিপুর্ন বিকল্প জীবিকায়নে সক্ষমতা সৃষ্টি অবশ্যই নিশ্চিত করবে সরকার ।

ঝ) বন বিভাগ পেশাজীবীদের জন্য গভীর বনে কিছু সংখ্যক বৃষ্টি নির্ভর পুকুর তৈরী করবে যাতে পেশাজীবীরা খাবার পানি গ্রহন করতে পারবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুকুরের পানি ফিল্টারিং করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঞ) পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইক্লোন সেন্টার উপকূলীয় অঞ্চলে তৈরী করতে হবে।

ট) পেশাজীবী ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য ভ্রাম্যমান মেডিকেল টিম এর ব্যবস্থা করতে হবে। যে টিমের অবশ্যই দ্রুত গতি সম্পন্ন যানবাহন ও অবশ্যই বিভিন্ন মৌসুম ও মহামারী রোধের ব্যবস্থা থাকবে।

ঠ) বন বিভাগ, পুলিশ ও কোষ্ট গার্ড সদা সর্বদা গভীর বনে টহল করবে যেখানে পেশাজীবীরা হয়রানি ও আক্রান্ত হয় এবং একাধিক জায়গায় এই টহল অব্যাহত রাখতে হবে।

ড) বনের পেশাজীবীদের জন্য নৌ পুলিশের মত আলাদা একটা ফোর্স গঠন করা প্রয়োজন। বিকল্পভাবে বনের গার্ডদের দক্ষতা, সংখ্যা, গ্রহণযোগ্যতা ও যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করে বিশেষ বাহিনীর মত করা যেতে পারে।

ঢ) সুন্দরবন এলাকায় কোন তেল অথবা গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করা যাবে না।

৬) সরকার নিয়োজিত বন বিভাগের কর্মকর্তাদের কল্যান/ সেবা;

সরকারী চাকুরীজীবীদের সেবা হলো যারা সরকারের অধীনে সুন্দরবনে নিয়োজিত হয়ে সুন্দরবনের প্রাপ্ত সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে বনের ইতিবাচক কর্মকান্ডের পরামর্শ প্রদান করে । এই ধরনের চাকুরীজীবীদের প্রথমে বনবিভাগ নিযুক্ত করে। কিন্তু এই দলে আরও অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে পুলিশ, উপকূলীয় নিরাপত্তা প্রহরী, মৎস্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, এবং অন্যান্য বিভাগ যারা তিন মাসের অধিক সময়ের জন্য বনে নিয়োজিত হয়।

ক) সকল সরকারী চাকুরীজীবীদের সুন্দরবনে প্রবেশের পর আপদ/বিপদ হলে ঝুঁকিভাতা প্রদান করতে হবে।

খ) সুন্দরবনে কর্মরত সকল সরকারী চাকুরীজীবীদের কঠোর পরিশ্রমের (দূঃসাধ্য) কাজের জন্য বিশেষ ভাতা দিতে হবে।

গ) অফিস এবং আবাসিক ভবন জলোচ্ছ্বাস ও উচ্চ জোয়ারের পানি নিরোধ এবং নিরাপদ হতে হবে।

ঘ) সকল অফিস ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা এবং এগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ মানব সম্পদ নিয়োগ দিতে হবে।

ঙ) সুন্দরবনের সকল সরকারী অফিসে দ্রুত গতি সম্পন্ন, খারাপ আবহাওয়ায় সহনশীল, সংবাদ / সংকেত আদান-প্রদান করা যায় এমন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত নৌযানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. বনজ সম্পদ আহরণকারীদের নিরাপত্তা ;

ক) সুন্দরবনের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত বনরক্ষী, পুলিশ, উপকূলরক্ষী ও র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ানদের উন্নত অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিতে হবে।

খ) বনের নিরাপত্তা প্রহরীর সংখ্যা এবং পাহারার দক্ষতা বাড়াতে হবে ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে।

গ) হিন্দুদের রাশ মেলা চলাকালীন সময়ে বনের নিরাপত্তা প্রহরীর সংখ্যা বাড়াতে হবে, মাত্র কয়েকটি প্রবেশপথে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে, অন্য প্রবেশ পথগুলিতে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আইনকানুন কঠোর করতে হবে।

৮. বনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগনের সেবা ও নিরাপত্তা;

ক) বন সীমানার বাইরে কেহ সুন্দরবনের বন্য পশু দ্বারা মৃত্যু, আঘাত প্রাপ্ত অথবা পঙ্গু হলে ক্ষতি পূরণের দাবিদার হবে।

খ) যদি কোন ব্যক্তির সম্পদ, গবাদি পশু অথবা শস্য বন্য পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে সে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরনের দাবিদার হবে।

গ) ব্যক্তিগত অথবা যৌথভাবে সুন্দরবন সংরক্ষণের কাজের সম্পৃক্ততার জন্য পুরষ্কার অথবা প্রণোদনামূলক ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের পেক্ষাপটে বন আইনের সীমাবদ্ধতা/অপার্যাপ্ততা

বাংলাদেশের বন আইন একমাত্র আইন যা বনসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুন্দরবনের জন্য আলাদা কোন আইন নেই এমনকি ব্যতিক্রম ধর্মী "সংরক্ষিত বন" মর্যাদার পরও, এছাড়া আইনটি অনেক অনেক দিনের পুরানো। বন আইনটি সতর্কতার সাথে পাঠ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে:

১. আইনটিতে কোন প্রকার কল্যাণমূলক মটিভেশন/অনুপ্রেরনা নাই

২. আইনটি বেশীর ভাগ রাজস্ব আদায় সংশ্লিষ্ট

৩. বনের উপর জনগনের ভূমিকা বা প্রভাব হয় অনুপস্থিত অথবা অবজ্ঞা করা হয়েছে।

৪. বনবিভাগ বনের সম্পদ বাটোয়ারার ক্ষমতা ভোগ করে অসীম অন্যদিকে জনগনের প্রতি দায়িত্ব খুবই কম

৫. বন আইনের ইতিবাচক দিক হলো এতে সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্বীকার করে বন্যপ্রানী সংরক্ষণের বিষয়ে স্বচ্ছ ভাবে নির্দেশ আছে

এই আইনে পরিবেশগত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা হয়নি, অপরদিকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারকও নয়। অতঃপর যখন সুন্দরবনের সম্পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে তখন সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী বর্তমান প্রচলিত আইনকে যথেচ্ছাভাবে ব্যবহার করছে যা পরিবেশ সংরক্ষণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সাথে সাথে বন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে কিছু দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী সদস্য তৈরী করেছে।

গত দুই দশকের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ধারনা জনগনের মনোযোগ আকর্ষন করেছে। বিশ্বের অনেক দেশের সরকার এই ইস্যুতে কোন সাড়া দেয় নাই। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ একটা ভাল উদাহরণ যারা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

সকল ইতিবাচক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও বন আইনে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু সম্পৃক্ত করতে পারে নাই যা এখন খুবই প্রয়োজন। তবে বর্তমানে সরকারের ন্যাশনাল এ্যাডাপটেশন প্লান অব এ্যাকশান (NAPA) এ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন পলিসি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ও জারি করা হয়েছে। এই মুহূর্তে রিভিউ এর আওতায় আছে।

উপরের ব্যাখ্যা থেকে এবং বাস্তবতায় আমরা উপসংহারে বলতে পারি, বন আইন যখনই জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে তৈরী হবে তখনই এর সুফল সুন্দরবনের উপর পড়বে ।

যাই হোক খুব দ্রুত সরকারের মাধ্যমে একটা আইনের উপস্থাপনের দাবি রাখে সুন্দরবন, যা সুন্দরবন রক্ষার ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদজনক অবস্থাকে নির্দেশ করবে। সুন্দরবন পর্যবেক্ষণ আমাদের যা বলে :

(ক) উচ্চতর জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট লবণাক্ততার জন্য হরিণ, শুকর এবং অন্যান্য সমজাতীয় প্রানীর বিচরণ ক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে ঝুঁকিপূর্ণ এই জীবজন্তুর বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে কিছু সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও প্রচার করা একান্ত প্রয়োজন।

(খ) লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে সুপরিচিত সুন্দরী গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ঝুঁকিপূর্ন হয়ে পড়েছে। কোন কোন এলাকায় ঐ প্রজাতির গাছ উন্নতি লাভ করছে এবং বৃদ্ধি প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত বাঁধাগ্রস্থ হয় নাই তা বের করার আইন বা নীতিমালা জরুরীভাবে প্রয়োজন।

(গ) বনের বিভিন্ন অংশে কিছু প্রজাতি ভালভাবে জন্মাচ্ছে তার প্রতিবেদনের জন্য লোকেরা বনের মধ্যে কাজ করছে। সুন্দরবনের উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন কোন প্রজাতির বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে আবার কোন কোন প্রজাতির বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আইন ও নীতিমালা প্রয়োজন।

(ঘ) উপরে উল্লেখিত খ ও গ অবশ্য মৎস্য বিভাগের জন্য প্রযোজ্য।

(ঙ) ক্রমহ্রাসমান বন, বাঘের মত ভয়ঙ্কর জীব খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে বের হয়ে আসতে বাধ্য করছে। র‍্যাড মানি (ভারতে উৎসাহিত করা হচ্ছে) এর মত পুরস্কৃত করার নীতি অবশ্যই ঐ সমস্ত জীবজন্তুকে রক্ষা করবে।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি শুধুমাত্র কিছু এলাকার জন্য যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আইন সংস্কার করার প্রয়োজন। সরকারের নিকট হতে দ্রুত সাড়াপ্রাপ্তি, জনগনের কাছে তাদের বিশ্বাস যোগ্যতা তৈরী করবে এবং সাথে সাথে হাজার হাজার পরিবারের জীবিকায়নও নিশ্চিত হবে।

প্রচলিত বন আইনের মধ্যে এই পলিসি অনুশীলন/ খাপ খাওয়ানো সুযোগ

এই জলবায়ু সহনশীল জনমুখী সুন্দরবন নীতিমালার গবেষণালব্ধ বিষয়সমূহ বন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে এ বিষয়ে অধিকতর দায়িত্বশীল করে তোলার জন্য, যাতে করে বন সম্পদ রক্ষায় বন ও তার উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীদের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ভবিষ্যৎ ঝুঁকি, যা বনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে, এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা থেকে স্বপ্রনোদিত হয়ে বন বিভাগ কিছু উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে যেমন:

(ক) বিশেষভাবে প্রধান প্রধান সম্পদ আহরণের সময়কে বিবেচনায় রেখে কিছু কিছু এলাকায় আহরণযোগ্য সম্পদ আহরণের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া এবং ঘোষনা করা।

(খ) বন ব্যবহার কারীদের বীজ অথবা চারা গাছ এবং কৌশলগত অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অংশীদারিত্বে সুন্দরবনের পুনঃবনায়নের জন্য অব্যবহৃত কিছু এলাকার সীমানা চিহ্নিত করা।

(গ) বৈজ্ঞানিকভাবে আনুপাতিক হারে সম্পদ পর্যাপ্ততার উপর ভিত্তি করে পাশপারমিট ইস্যু করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বন বিভাগ স্থানীয় কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং গবেষনা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহন করতে পারে। সাথে সাথে বন বিভাগের মাধ্যমে আহরণ ও পুন:বনায়নকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করতে পারে। এর আগেই বন বিভাগকে উৎপাদনশীলতা ও প্রভাবিত জোন বিবেচনায় রেখে বনের সীমানা নির্দিষ্ট করতে হবে।

যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং উপকূলীয় এলাকার জীবিকায়নের ঝুঁকি বৃদ্ধি, তেমন জীবন ও জীবিকায়ন সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবনের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগনকে বিশেষ করে সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগনকে তৈরী ও সচেতন করা অতি জরুরী।

সূত্র:

১. আলী, এ. ১৯৯০। বাংলাদেশের (সমুদ্রতট/ সমুদ্র উপকূল) ভাঙ্গন এবং সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি। আইওসি/ ইউএনইপি (জাতীসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প) এর টাস্কফোর্সের দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাবের কারন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

২. বিউপি/ সিইএআরএস/ সিআরইউ, ১৯৯৪ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রীন হাউস প্রভাব সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টস নম্বর ১-৭ পৃষ্ঠা। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা; পরিবেশ ও গবেষনা শিক্ষা কেন্দ্র, ওইকাতো বিশ্ববিদ্যালয়, হ্যামিলটন, নিউজিল্যান্ড; জলবায়ু গবেষনা ইউনিট, পূর্ব এ্যানজিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নরউইস, ইউকে।

৩. বাংলাপিডিয়া ২০০৮ (বাংলা বিশ্বকোষ, ২০০৮)

৪. কেসস্টাডি অব ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইউনেস্কো, ২০০৭

৫. আইপিসিসি ১৯৯০, জলবায়ু পরিবর্তন: আইপিসিসি বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারন, ক্যামব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস, ক্যামব্রিজ, ইউকে।

৬. আইপিসিসি ২০০৭, জলবায়ু পরিবর্তন ২০০৭: প্রভাব, খাপখাওয়ানো এবং ঝুঁকিপূর্ন। আইপিসিসি এর চতুর্থ এ্যাসেসম্যান্ট রিপোর্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ- ২ এর কনট্রিবিউসন । জলবায়ু পরিবর্তনের আন্ত:সরকার প্যানেল, ক্যামব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস, ক্যামব্রিজ, ইউকে।

৭. আইইউসিএন - ২০০২। বায়ো-ইকোলজিক্যাল জোন অব বাংলাদেশ। আইইউসিএন বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস, ঢাকা।